সত্যের আলোকে আনন্দময়ী ও সুচরিতার প্রতিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ

রেজিনা কবীর

অধ্যাপিকা,

দর্শন বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

ভারতীয় দর্শন মতে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য তথা পরম পুরুষার্থ হ'ল মোক্ষ বা মুক্তি। মুক্তি অর্থে দুঃখ মুক্তিকে বোঝানো হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে 'মুক্তি' শব্দের অর্থ নির্ধারণ করা হয় 'বন্ধননিবৃত্তি' অবিদ্যাই জীবের বন্ধন, সেই অবিদ্যারূপ বন্ধনের নিবৃত্তিই মোক্ষ (ভট্টাচার্য, দর্শন কোষ, ১০৭) আবার ন্যায় দর্শন মতে যে বস্তু যে রকম নয়, তাকে সেরকম বোঝাই মিথ্যাজ্ঞান। যথা আমরা যদি আত্মাকে অনাত্মা বলে বুঝি, দুঃখকে সুখ বলে বুঝি তাহলে আমাদের সেই জ্ঞানকে মিথ্যা বলে গণ্য করা হবে। এই সব মিথ্যা জ্ঞানের নিরাস হলেই সত্যজ্ঞানের উদয় হয়। তাতেই জীবের মুক্তি (দাস, প্রবন্ধ, ৯৬)। আমরা সকলেই যে দুঃখ থেকে মুক্তি চাই এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল তা কী উপায়ে লাভ করা যাবে?

শাস্ত্রমতে ধর্ম পালনের দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব। প্রশ্ন জাগে তবে ধর্ম কী? 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা ধরিয়া রাখে'- অর্থাৎ যা মানব সমাজকে ধরে রাখে অর্থাৎ রক্ষা করে তাই ধর্ম। ধর্ম শব্দটিকে এই অর্থে গ্রহণ করলে নীতি, সদাচার, সততা প্রভৃতিকে ধর্ম বলা যায় (গুপ্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম দর্শন, ৩)। মনুষ্য চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসে ধর্মের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ধর্ম মানুষের জীবনে কেন্দ্রিয় স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু 'ধর্ম কী'?- এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়। মনুষ্যচিন্তার বিবর্তন ও পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মের স্বরূপও পরিবর্তিত হওয়ায় ধর্মের সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা সম্ভব নয়। অধ্যাপক গ্যালোয়ের ভাষায় বলা যায়- "Man's faith in a power beyond himself whereby he seek to satisfy emotional need and gains stability of life and which he expresses in acts of worship and service" (Galloway, Religion, 184) - যার ভাবানুবাদে বলা যায়

ধর্ম হ'ল মানুষের নিজ অতিবর্তী কোন শক্তিতে এমন এক আস্থা বা বিশ্বাস যার দ্বারা সে তার আবেগমূলক অনুভূতিকে তৃপ্ত করে, জীবনে স্থিতাবস্থার অধিকারী হয় এবং যে আবেগ বা অনুভূতিকে সে পূজা, আরাধনা ইত্যাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে। আপাত গ্রহণযোগ্য এই সংজ্ঞাকে খুব সহজে বোঝার চেষ্টা করলে- সত্য জ্ঞানকে লাভ করে আমাদের অনুভূতিকে তার দ্বারা অনুবিদ্ধ করে তদনুসারে কর্ম পালন করাই ধর্ম। সুতরাং সত্যজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়। কিন্তু যারা শাস্ত্র মানেন না- তাদের কী উপায়? তাদের জন্য সমাজই তাদের মুক্তির পথ নির্ধারণ করে। জিজ্ঞাসা হয় এই মুক্তিলাভের অধিকারী কারা? যারা আত্মজিজ্ঞাসাশীল অর্থাৎ মানুষ। মানুষই সত্য লাভ করতে পারে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা হয় শাস্ত্র বা সমাজ নির্ধারিত কোন বিধি বা নিয়মকি আমরা নির্বিচারে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি? মননশীল জীব হিসেবে মানুষের পক্ষে নির্বিচারে কোন মতামত বা বিশ্বাসকে মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়। রাসবিহারী দাসের উক্তিতে- ''মনুষ্যত্বের দাবী বজায় রাখিয়া আমার নিজস্ব বোধ ও বিচার অগ্রাহ্য করিব, আমার আত্মপ্রত্যয়ের উপর আস্থা না রাখিয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা অকপটে বলিতে থাকিব ইহা কখনো সম্ভবপর নয়''(দাস, প্রবন্ধ, ১১-১২)। যুক্তিহীন বিচারে যে ধর্মহানি হয় তারও স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়- "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যং বিচারণং, যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে" (দাস, প্রবন্ধ, ১৩)। সুতরাং সত্যোপলব্ধির জন্য ধর্মপথ অবলম্বণ করাই হোক অথবা সমাজ নির্ধারিত পথ অনুসরণ হোক তা অবশ্যই আত্মপ্রত্যয়যুক্ত সযৌক্তিক বিচারের দ্বারাই সম্ভবপর। এস্থলেই বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের প্রভেদ। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ের লক্ষ্যই সত্যান্বেষণ হলেও বিজ্ঞানের সমস্যাগুলি বিষয় কেন্দ্রিক অপরপক্ষে দার্শনিক সমস্যাগুলি আত্মকেন্দ্রিক (দাস, প্রবন্ধ, ১৮)। প্রতিটি মানুষ তার স্বস্বরূপে অনন্য হওয়ায় তাদের প্রত্যেকের বিচার শৈলীর স্বাতন্ত্র অবশ্যস্বীকার্য। বিচার শৈলীর স্বাতন্ত্র হেতুই সত্য লাভের উপায়ও নানান হতে পারে। কিন্তু সত্য এক শাশ্বত ও কল্যানময়। শাস্ত্র আমাদের সত্যের সন্ধান দেয়, নাকি সমাজ নির্ধারিত পথই আমাদের মুক্তির সহায়ক- এই দ্বন্দ্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গোরা' উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি ছত্রেই লক্ষ করা যায়। উত্তর খুঁজে নেওয়ার দায় প্রতিটি মনণশীল সত্বার নিতান্ত ব্যক্তিগত। প্রতিটি মানুষের পক্ষেই নিজ নিজ আত্মপ্রত্যয় যুক্ত সযৌক্তিক বিচারের দ্বারা সত্যানুভব বা সত্যোপলব্ধি সম্ভব (দাস, প্রবন্ধ, ১৩)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘গোরা’ উপন্যাসে দুটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যারা এই সত্যের স্বরূপ নিজ নিজ পথে লাভ করেছেন- আনন্দময়ী ও সুচরিতা। সত্যের যে উপলব্ধি বা বোধ তারা অনুভব করেছেন সেই অনুভব অনুগামী আচরণ অনেক সময়েই প্রচলিত রীতি-নীতি বা শিষ্টাচারের সীমাকে লঙ্ঘণ করে গেছে। তাই সমাজে বহু ক্ষেত্রেই তাদের নিন্দিতও হতে হয়েছে। স্বজ্ঞায় লব্ধ সত্য রক্ষার্থে আনন্দময়ী এমন অনেক বিশ্বাস মনে লালন করেছেন যা তাদের এমন কতকগুলি আচরণে প্রবৃত্ত করেছে যে তাদের প্রতিবাদী না বলে উপায়ন্তর নেই।

উক্ত উপন্যাসে যে সকল নারী চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তাদের সমবয়স্কতা অনুসারে ভাগ করলে প্রধাণত দুটি শ্রেণী পাওয়া যায়। যাদের এক সারিতে- আনন্দময়ী, বরদাসুন্দরী ও হরিমোহিনীকে রাখা যায়। অপরদিকে যে দুটি বিশিষ্ট চরিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা হলেন সুচরিতা ও ললিতা। এই চরিত্রগুলির মধ্যে যদি প্রতিবাদী নারী চরিত্রের সন্ধান করি তাহলে হরিমোহিনী বাদে বাকী সকলকেই প্রতিবাদী বলে গণ্য করতে হয়। প্রতিবাদী নারী কাদের বলা যায়? তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের আচার আচরণ সংক্রান্ত যে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধের উল্লেখ আছে- সেগুলি যারা মান্য করবেন না বা উলঙ্ঘণ করবেন তাদেরকেই প্রতিবাদী নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে আনন্দময়ী যেমন প্রতিবাদী, ঠিক তেমনি বরদাসুন্দরীকেও প্রতিবাদী বলতে হয়। সুচরিতা ও ললিতাও নিজ নিজ বিশিষ্টতা সহ প্রতিবাদী চরিত্ররূপে গণ্য হতে পারেন। কিন্তু চরিত্রগুলির মধ্যে এক বিশেষ বিশিষ্টতা লক্ষিত হয় আনন্দময়ী ও সুচরিতার চরিত্রের মধ্যে। তাদের প্রতিবাদ সেই মিথ্যা আচারের বিরুদ্ধে যা সত্য অনুভবকে খর্ব করে। এইখানেই এই দুটি চরিত্রের ঐক্য। স্বজ্ঞালব্ধ সত্যই এই দুই নারী চরিত্রকে প্রতিবাদী করে সমন্বিত করে নচেৎ আনন্দময়ী ও সুচরিতার মধ্যে নানা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়- এমনকি তাদের প্রতিবাদের ধরণটিও যেন বিপরীতধর্মী।

আনন্দময়ীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়- ‘‘তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই একটা জিনিস সকলের চোখে পড়ে- তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন।’’ (রবীন্দ্রনাথ, গোরা, ১৯) - তৎকালীন সমাজে হিন্দু রমণীদের শেমিজ পরা যে নিষিদ্ধ ছিল তা নয়, কিন্তু তা ছিল অপ্রচলিত। যা দৃষ্টান্তহীন বা অপ্রচলিত তার রূপায়ণ বা অবলম্বণেকেও এক ধরণের প্রতিবাদ বলেই মনে করা যায়। আনন্দময়ীর বিশেষত্ব হ’ল- সর্বপ্রকার আচার বিচারগত সংস্কার নিরপেক্ষতা। প্রচলিত ধর্মীয় রীতি-নীতি, ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কার যে তিনি ত্যাগ করেছেন তা তাকে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত করতে পারেনি, বরং তাঁর সংস্কারহীণতা তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত বিনম্রতাসহ সহজ ও সরল আন্তরিকতার মাধ্যমে।

আনন্দময়ীর এই প্রকার সংস্কারহীনতার উৎসরূপে তাঁর অন্তর্নিহিত মাতৃত্বধর্মের পরম কল্যানময় রূপটুকু আমাদের কাছে উদ্ভাষিত হয়। নিঃসন্তান রমণী যখন দৈবক্রমে গোরাকে সন্তানরূপে লাভ করেন তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। শিশুর যদি জাত না থাকে, তাহলে মায়ের কি জাত থাকতে আছে? মায়ের যে জাত হয় না এই উপলব্ধি গোরাকে নিঃসংকোচে সন্তানরূপে গ্রহণ করার থেকেই উদ্ভুত। যে মুহূর্তে তিনি গোরাকে সন্তানরূপে বুকে তুলেছেন সেই মুহূর্তেই ধর্ম তথা ধর্মানুসৃত সমাজসৃষ্ট সর্ববিধ সংকীর্নতার গন্ডীকে তিনি অনায়াসে অতিক্রম করেছেন। তিনি মুক্তির উপায়রূপ সত্যের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছেন তথা আত্মস্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

আচারনিষ্ঠ না হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি গোরার যে ভর্ৎসনা ও স্বামীর যে উদাসীনতা লক্ষ করা যায়- তার তিনি নীরব প্রতিবাদ করেন নিরভিযোগ সহিষ্ণুতার মাধ্যমে। সামাজিক বা ধর্মীয় রীতি নীতির কষ্টিপাথরে বিচার না করে তিনি পরকে আপন করেছেন তাঁর স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির আলোকে। আনন্দময়ীর ব্যবহার ও কথাবার্তায় যে গভীর অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রবাহ নিতান্ত স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক, করুণায় ও সহানুভূতিতে শীতল।

আনন্দময়ীর মধ্যে দিয়ে বিশ্বজনীন মাতৃত্বের মহিমা প্রতিফলিত হয়। তাঁর অসামান্য সত্যের আলোকে তিনি যেন সমস্ত বিষয়ের কল্যাণময় রূপটি দেখতে পান। তাই তিনি মহিমকে বার বার নিরস্ত করেছেন বিনয়ের সাথে শশীকুমারীর বিবাহ প্রসঙ্গ আলোচনার থেকে। এতে যে বিনয় অথবা শশীকুমারী কারোরই মঙ্গল হবে না, তা তিনি সাক্ষাৎ বুঝতে পেরেছিলেন। অপরদিকে বিনয় ও ললিতার বিবাহকে সমর্থন করে তিনি সওয়াল করেছেন যে হৃদেয়ের কোন জাত নেই, সেখানেই ঈশ্বর সকলকে মেলান ও নিজেও এসে মেলেন। তাকে অস্বীকার করে মন্তর ও মতের ওপর মেলাবার ভার দিলে চলবে কেন? তিনি আরো বলেছেন- ''দেখো মা, ভালোর সঙ্গে মন্দ মেলাই সব চেয়ে কঠিন, কিন্তু তবু পৃথিবীতে তাও মিলছে আর তাতেও সুখে দুঃখে চলে যাচ্ছে- সব সময়ে তাতে মন্দই হয় তাও নয়, ভালোও হয়। এও যদি সম্ভব হ'ল তবে কেবল মতের একটুখানি অমিল নিয়ে দুজন মানুষ যে কেন মিলতে পারবে না,আমি তো তা বুঝতেই পারি নে। মানুষের আসল মিল কি মতে?'' (রবীন্দ্রনাথ, গোরা, ৩৩১) তাঁর এই সওয়ালের মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও বিশ্লেষণী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল এই বিচার শক্তির অধিকারীই তিনি নন, নির্ভীক বক্তাও বটে। তিনি তাঁর প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের শীতল ছায়ার মাধ্যমে। বিনয় যখন ললিতার সাথে তার বিবাহ আদৌ সম্ভবপর কিনা- এই দ্বিধার মধ্যে দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন, সেই সংকটাপন্ন অবস্থাতে আনন্দময়ীই তাঁকে সঠিক দিশা নির্ধারণে সাহায্য করেন। কেবল তাই নয়- ললিতাকে বিবাহ করার জন্য যে তাকে তার নিজ ধর্মকে ত্যাগ করতে হবে তারও কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেননি। এই উদারতা তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধর্মনীতির বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিবাদ স্বরূপ। তাঁর সমাজের শূচিতা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর প্রতি উদাসীনতা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সমাজকে ত্যাগ করেননি। সমাজ তাকে ত্যাগ করলেও তাঁর তাতে বিশেষ অসুবিধে বোধ হ'ত না। সমাজের ঔদাসীন্যের সাথে সাথে তিনি তাঁর স্বামী ও পুত্রের উদাসীনতা ও উপেক্ষাকে মাথা পেতে নিতে পেরেছেন তাঁর সত্যোপলব্ধির জোরে।

আনন্দময়ী চরিত্রটি বিশ্বজনীন মাতৃত্বের প্রতিমারূপে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় বরদাসুন্দরী যেখানে তাঁরনিজ সন্তান ললিতার মধ্যে আন্দোলনকারী চিন্তাপ্রবাহের অংশীদার হতে পারেননি, সেখানে কি অনায়াসে আনন্দময়ী ললিতার সমস্ত অন্তর্দাহ অনুভব করেছেন কেবল তাঁর সহজ নির্মল মাতৃত্বের ছোঁয়ায়। ঠিক একইবাবে হরিমোহিনীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সন্তানহারা মাতৃহৃদয়ের বেড়ি দিয়ে সুচরিতাকে বাঁধতে পারেননি। সুচরিতা সেই বাঁধন ছিঁড়ে বার বার আনন্দময়ীকে মা রূপে মনে মনেবরণ করে তার নিজের বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টা করেছে, উপন্যাসের শেষ পর্বে দেখা যায় আনন্দময়ীর বিশ্বজনীন মাতৃত্বের স্বরূপ গোরার কাছেও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সমস্ত জীবনের গ্লানি, দ্বিধা, অন্তর্দাহ থেকে আনন্দময়ীর মাতৃত্বের শীতল ছায়াতেই সে শুদ্ধ হয়, মুক্ত হয়, সত্যের স্বরূপ তথা তত্ত্বদর্শন করে।

প্রবন্ধে আলোচ্য অপর প্রতিবাদী নারী চরিত্র সুচরিতা প্রসঙ্গে বলা যায় চরিত্রটি উপন্যাসের যেরূপে চিত্রিত হয়েছে তার থেকে স্পষ্ট হয়- সে আত্মাভিমানী, যুক্তিপূর্ণ মতামত উপস্থাপনে পারদর্শী ও বিনম্র হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী। সুচরিতার যে প্রতিবাদ তা অত্যন্ত সংযত ও মার্জিত। সে তার নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেও সকল কর্তব্য অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে পালন করে। কিন্তু সুচরিতা কখোনই কর্তব্যের অজুহাতে সত্যকে অমর্যাদা করেননি। তার বিচারলব্ধ সত্যের মর্যাদা রক্ষার্থে সুচরিতাকে বহুবার প্রতিবাদী হতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত বলা যায় সুচরিতার ভাবী স্বামী হারানবাবু যখন ব্রাহ্ম সমাজ বহির্ভূত বিনয়বাবুদের সাথে তাদের পরিবারের অন্তঃপুরের মেলামেশাকে নিন্দা করেছেন, সুচরিতার খোলা মনে সমর্থন তাতে কোনদিন ছিল না। হারানবাবুর এই নিন্দার প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি তা বহুবার অগ্রাহ্য করেছেন। এ বিষয়ে বরং বিনয়বাবুর সাথেই তার মতের মিল লক্ষ্য করা যায়। কেননা তাদের উভয়ের কাছেই মতবাদের থেকে মানুষ বেশি মূর্ত রূপে প্রতিভাত হয়। তত্ত্ব অপেক্ষা মানুষ অনেক বেশি সত্যরূপে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। আগে মানুষ, মতবাদের স্থান তার পরে গুরুত্ব পায়। এই মতের বিশেষ সমর্থন আমরা উপন্যাসের সেই অংশে পাই

যেখানে বরদাসুন্দরীর অমানবিক অত্যাচারে সংকুচিত হতে হতে হরিমোহিনী যখন প্রায় আশ্রয়হীন হতে বসেছেন, তখন মানব ধর্মের অবমাননা সহ্য করতে না পেরে সুচরিতা পরেশবাবুর নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও সাহচর্য ত্যাগ করে অন্য বাসায় বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হননি। আবার হারানবাবু যখন তার পিতা তথা ধর্মগুরু, পরেশবাবুকে অপমান করতে উদ্যত হয়েছেন- হারানবাবুর এই স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্যকে সুচরিতা ক্ষমা করতে পারেন নি। হারানবাবুকে বিবাহ করতে যে তিনি অসম্মত তা দৃঢ় চিত্তে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।

সুচরিতার প্রতিবাদী সত্তার সাথে তার কর্তব্যের বিরোধ কখনোই লক্ষ্য করা যায় না। সুচরিতা তার কর্তব্যে সদাই অবিচল সেই কর্তব্য নির্ধারণের মানদণ্ড তার নিজ স্বজ্ঞালব্ধ সত্যধর্ম। অপমানিত হরিমোহিনীর সেবার তাগিদে সুচরিতা সাময়িকভাবে সকলের হাতের ছোঁয়া খাবার গ্রহণ করার থেকে নিজেকে বিরত রাখে, আবার সেই হরিমোহিনীর অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে তাকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। হরিমোহিনীর দেবর কৈলাসবাবুকে বিবাহ করতে সুচরিতা অসম্মতি জানান অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে সুচরিতাকে বলতে শুনি- ''আমি বিবাহ করব না''। হরিমোহিনী বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করেন 'বুড়ো বয়স পর্যন্ত এমনি-' তাঁর কথা সম্পূর্ণ হতে না দিয়ে সুচরিতা উত্তর দেন 'হাঁ মৃত্যু পর্যন্ত', (রবীন্দ্রনাথ, গোরা, ৪৭৬) - এই উক্তি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় একটি নারীর প্রতিবাদী সত্তার চরম পরিচায়ক। কেননা তদানীন্তন সমাজে নারীদের জীবনে বিবাহই যেন চরম লক্ষ্য রূপে নির্ধারিত ছিল। তার সাক্ষ আমরা পাই হরিমোহিনীর অনুরোধে লেখা গোরার চিঠিতে। গোরা লিখছেন- ''বিবাহই নারীর জীবনে সাধনার পথ, গৃহধর্মই তাহার প্রধান ধর্ম। এই বিবাহ ইচ্ছাপূরণের জন্য নহে, কল্যান সাধনের জন্য। সংসার সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক, একমনে সেই সংসারকেই বরণ করিয়া, সতী সাধ্বী পবিত্র হইয়া, ধর্মকেই রমণী গৃহের মধ্যে মূর্তিমান করিয়া রাখবেন- এই তাঁহাদের ব্রত'' (রবীন্দ্রনাথ, গোরা, ৪৯০)। সুচরিতা সমাজব্যস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এই বিধানকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু সেই একই বিধান যখন গোরার মাধ্যমে আদেশরূপে তার কাছে

ফিরে এসেছে তখন বিনা বাক্যব্যয়ে তা মাথা পেতে নিয়েছেন- তাঁর সত্য প্রেমের মর্যাদা রক্ষার তাগিদে। এও যে প্রতিবাদেরই নামান্তর।

মানবধর্মই সত্য ধর্ম। এই সত্য সুচরিতা উপলব্ধি করেছেন তাঁর সমস্ত হৃদয় ও অনুভূতির মাধ্যমে। সুচরিতার ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ মানব ধর্ম তথা সত্যই ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য। উপন্যাসের শেষ পর্বে দেখা যায় গোরার মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুচরিতা নিজেকে হিন্দু বলেই বিশ্বাস করতে চান। কিন্তু সেই বিশ্বাস কোথায় যেন তাঁর বোধের কাছে অস্পষ্ট- সেই অস্পষ্টতা দূরীকরণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম পরেশনাথবাবুর কাছেই সুচরিতার মন সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। সুচরিতার আত্মজিজ্ঞাসাশীল হৃদয় অতীতের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ স্বীকার না করেই প্রেমের সাথে সমস্ত নবীন আদর্শের সমন্বয়ের মাধ্যমে এক কল্যানময় জীবন বরণ করে নিয়েছে। আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসার পথ দিয়েই সুচরিতার আত্মস্বরূপের পূর্ণ বিকাশ সমন্বিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Galloway, George, *Studies in the Philosophy of Religion*, William Blackwood and Sons, Edinburgh and London: MCMIV, 1904.

গুপ্ত, কল্যানচন্দ্র, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ, *ধর্ম দর্শন*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০।

চ্যাটার্জী, অমিতা, সম্পাদিত, *ভারতীয় ধর্মনীতি*, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গোরা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫।

দাস, রাসবিহারি, *কতিপয় দার্শনিক প্রবন্ধ*, বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ, কলকাতা, ১৯৭৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পঞ্চম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭২।

ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন, ও ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র, *ভারতীয় দর্শন কোষ*, তৃতীয় খন্ড, প্রথম ভাগ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৮১।

মন্ডল, নিখিলেশ, *রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীর মুল্যবোধের স্বরূপ*, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, দ্বাবিংশতি বর্ষ, কলকাতা, ১৪১৫।

স্যান্যাল, ইন্দ্রাণী, ও দত্ত শর্মা, রত্না, *ধর্মনীতি ও শ্রুতি*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৯।